কোন কাজে কত ঘুষ!

ঘুষ দেয়া-নেয়াটা এখন আমাদের সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পদক্ষেপেই ঘুষের টাকা গুনতে হচ্ছে। সমাজ এটাকে এখন আর গর্হিত অপরাধ মনে করে না। সরকারিভাবে কোনো ঘুষের হার না থাকলেও সরকারি অফিসগুলোতে সকল বৈধ এবং অবৈধ কাজের জন্যই উৎকোচের হার নির্ধারিত হয়ে আছে। এই হার জানা থাকাটাও এখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে...

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল** ও **খন্দকার তাজ উদ্দিন**
সহযোগিতায় : **সাজেদুর রহমান ডা. ফায়েজ সাজ্জাদ, মাহমুদ রাজু খন্দকার তানভীর জামিল ও মারুফ রনি**

ঘুষের বাজারদর

কাজ	ঘুষের পরিমাণ
স্কুলে ভর্তি	৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি	৫০ হাজার থেকে ২ লাখ
নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি	৫০ হাজার থেকে ২ লাখ
সরকারি চাকরি	৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ
পুলিশের চাকরি	৭০ হাজার থেকে ৪ লাখ
পুলিশের বদলি	৫০ হাজার থেকে ৩০ লাখ
পুলিশ দিয়ে নির্যাতন করাতে	৩০ থেকে ৫০ হাজার
পুলিশ দিয়ে খুন করাতে	২ থেকে ৫ লাখ
বাড়ির প্ল্যান পাস করাতে	৩০ হাজার থেকে ৬ লাখ
সরকারি হাসপাতালে ভর্তি	১০০ থেকে ২ হাজার
পাসপোর্ট করাতে	৩ হাজার
অবৈধ পাসপোর্ট	১৫ হাজার
ড্রাইভিং লাইসেন্স	৬ হাজার
আমদানিকৃত পণ্য খালাস	১৫ থেকে ২০ হাজার
হাউজ লোন	১ থেকে ৫ লাখ
১ লাখ টাকার জমি রেজিস্ট্রি	১২ হাজার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিভাগের এক অধ্যাপক কয়েক বছর পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পেট্রোবাংলায় যোগদান করার কয়েক দিন পরে তিনি জানতে পারলেন, সেখানে এক মিটার রিডার কয়েক কোটি টাকার মালিক। স্বল্প বেতনে মিটার রিডারের চাকরি করে কোটিপতি! যে পরিচালকের কাছে তিনি তথ্যটি পেয়েছিলেন, তাকেই একদিন বললেন, 'মিটার রিডার সাহেবকে একদিন ডাকেন না, কোটিপতির সঙ্গে একটু চা খাই।' জবাবে পরিচালক বললেন, 'স্যার, আমাদের এখানে কোটিপতি মিটার রিডার একজন আর তিতাস গ্যাসে এরকম মিটার রিডার ১০ জন। শুধু তাই নয়, তিতাস গ্যাসে একজন ড্রাইভার আছেন যার নিজের দামি গাড়ি আছে। সে গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভারও রেখেছে।' চেয়ারম্যানের বিস্ময় বেড়ে গেল। তিতাস গ্যাস কোম্পানিতে সামান্য বেতনে ড্রাইভারের চাকরি করে নিজেই গাড়ি কিনে ফেলেছে! ড্রাইভারও রেখেছে! সেই ড্রাইভার আবার তাকে গাড়িতে করে অফিসে দিয়ে যায় আর বাসায় নিয়ে আসে। মিটার রিডারের কোটিপতি হওয়া আর তিতাসের ড্রাইভারের নিজস্ব গাড়ির মালিক হওয়ার রহস্য অবশ্য একটিই : 'ঘুষ'। একটু ভদ্রভাষায় বললে 'উৎকোচ।' 'উপরি' নামে পরিচিতি পেলেও হালে এর আরেক পরিচিতি 'স্পিডমানি।'

শুধু পেট্রোবাংলা বা তিতাস নয়,

বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথা সরকারি অফিসেই ঘুষের প্রচলন ও ব্যবহার সর্বাত্মক। কাজের ধরন অনুযায়ী শুধু পরিমাণে কম-বেশি হয়ে থাকে। ঘুষের প্রভাব এতোই সর্বগ্রাসী যে, এর লেনদেনে এখন আর কোনো সামাজিক লাজলজ্জা নেই বললেই চলে। নচিকেতার ভাষায় : 'ঘুষ আমার ধর্ম, ঘুষ আমার বর্ম, ঘুষ নিতে কি সংশয়/প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া এই দেশে অপরাধ, ঘুষ খাওয়া অপরাধ নয়।'

পুলিশি বকশিশ

এক পুলিশের বউ স্বামীর পকেট থেকে দশ টাকার নোট সরাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। রেগে স্বামী বলল, 'এ ধরনের চুরির অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো।' বউ তৎক্ষণাৎ স্বামীকে পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়ে বলে, 'ওগো আমাকে ছেড়ে দাও। এই নাও তোমার পুলিশি বকশিশ।' স্বামী বেজায় খুশি।

অপরাধ দমন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ পুলিশ বাহিনীর বিধিবদ্ধ কাজ হলেও এখন পুলিশ নিজেরাই অপরাধ করছে, অপরাধীদের লালন করছে। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ প্রায় সব ধরনের অপকর্ম করানো যাচ্ছে পুলিশকে দিয়ে যে কোনো পরিমাণ ঘুষ দিয়ে। দুই টাকার গোল্ডলিফ সিগারেট থেকে কোটি টাকার চাঁদা, কোনোটিতেই না নেই পুলিশের।

চাকুরি নেয়ার সময়ই পুলিশ সদস্যরা ঘুষ দিয়ে যাত্রা শুরু করে। সাব-ইন্সপেক্টর পদে ২ থেকে ৩ লাখ, এএসআই পদে ১ থেকে দেড় লাখ, সার্জেন্ট পদে ৩ লাখ, কনস্টেবল পদে ৭০-৮০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষের টাকা আবার তুলে আনতে হয় নিজেরা ঘুষ আদায় করে। আর এসব ঘুষের অর্থ ভাগাভাগি হয়ে কনস্টেবল থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে আইজির দপ্তর পর্যন্ত চলে যায়। বদলি হতে বা বদলি ঠেকাতেও ঘুষ আবশ্যক। দেশের বড় ও বেশি আয়ের থানাগুলোতে ওসি পদে বদলি হতে ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা ঘুষ লাগে। তেজগাঁও, মতিঝিলের মতো উচ্চ আয়ের সুযোগ আছে এমন থানাগুলোতে এসআই পদে বদলি হতে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা, এএসআই ৫ লাখ এবং কনস্টেবল পদে ১ লাখ টাকা উৎকোচ দিতে হয়।

পুলিশের স্লোগান হলো, 'সেবাই পুলিশের ধর্ম'। হ্যাঁ পুলিশ আপনার সেবা করবে যদি আপনি চাহিদা মতো উৎকোচ দিতে পারেন। থানায় মিথ্যা মামলা করতে হলে ২০ হাজার টাকা, পুলিশি নির্যাতন করাতে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা, নির্যাতন করে কাউকে খুন করাতে ২ থেকে ৩ লাখ

চাকুরি নেয়ার সময়ই পুলিশ সদস্যরা ঘুষ দিয়ে যাত্রা শুরু করে। সাব-ইন্সপেক্টর পদে ২ থেকে ৩ লাখ, এএসআই পদে ১ থেকে দেড় লাখ, সার্জেন্ট পদে ৩ লাখ, কনস্টেবল পদে ৭০-৮০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এই ঘুষের টাকা আবার তুলে আনতে হয় নিজেরা ঘুষ আদায় করে...

টাকা (যেমন, রুবেল হত্যা), প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী হত্যা করতে ১ থেকে দেড় লাখ টাকা, মিথ্যা রাজনৈতিক মামলায় হয়রানি করতে ৩৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা। এতো অবৈধ কাজে ঘুষের হার। আপনার বাসা-বাড়িতে চুরি-ডাকাতি হলে পুলিশ আসবে। সেজন্যও তাদেরকে ঘুষ দিতে হবে ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা। থানায় জিডি করতে গেলেও এরকম হারে কিছু খরচ করতেই হবে।

ঘুষ খাওয়ায় ট্রাফিক পুলিশই বা কম কিসে। ফিটনেসের অজুহাতে ট্রাকপ্রতি ২৫০-৫০০ টাকা, সিটি লোকাল বাস ১০০-৩০০ টাকা, ট্যাক্সিক্যাব ও প্রাইভেটকার ১০০ টাকা, মাইক্রোবাস ২০০ টাকা, সিএনজি ৫০ টাকা এবং মোটরসাইকেলের জন্য ১০০ টাকা দিতে হয়। যেসব রাস্তায় অযান্ত্রিক যান চলাচল নিষিদ্ধ, সেসব জায়গায় ১০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে রিকশা, ঠেলাগাড়ি ও মুরগির ভ্যান অনায়াসে পার করে নেয়া যায়।

পুলিশের মূলনীতি ঠিক করা হয়েছিল : 'শান্তি, শৃঙ্খলা, প্রগতি।' বাস্তবে তা রূপ নিয়েছে জনগণের দুর্গতি আর সামাজিক বিশৃঙ্খলায়।

রাজউক : ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না

দুর্নীতির দুর্বৃত্তায়নে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এখানকার ইট-কাঠ-পাথরও ঘুষ খায়। ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ানোর সাধ্য এখানে কারো নেই।

রাজউকে কোনো প্ল্যান পাস করাতে হলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে ফাইল নিয়ে সারা বছর দৌড়াদৌড়ি করেও সফল হওয়া সম্ভব নয়। এখানে তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ছোট পার্টির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করে দেয়। আর বড় পার্টি অর্থাৎ রিয়েল এস্টেট ও হাউজিং কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করে অফিসার পর্যায়ের লোকজন। বিধিমাফিক ফি যাই হোক না কেন, ১ তলা থেকে ৬ তলা পর্যন্ত বাড়ির নকশা অনুমোদন করাতে খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। একজন নির্দিষ্ট দালাল পার্টির হয়ে কাজ করে। প্রাথমিকভাবে সে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা অগ্রিম নেয়। বাকিটা কাজ শেষে। একটি প্ল্যান পাস হতে ফাইল ঘোরে ৩০ জনের কাছে। প্রত্যেকেই কিছু কিছু বখরা পায়। এ কাজকে 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' বলা হয়। স্থানভেদে কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। সাধারণত ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, রমনা, মতিঝিল, গুলশান, বারিধারা, তেজগাঁও এলাকায় প্যাকেজ প্রোগ্রামের ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ হাজার টাকা।

বহুতল ভবনের নকশা অনুমোদনে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা চুক্তি নিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে পার্টির সঙ্গে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এবং হাউজিং কোম্পানিগুলো অগ্রিম ১ লাখ টাকা প্রদান করে থাকে। কাজ শেষে বাকি টাকা শোধ করে।

বিরোধযুক্ত কোনো জমির ওপর রাজউক থেকে নিষেধাজ্ঞার নোটিশ আনতে খরচ হয় ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা। জমির দখল নিশ্চিত করতে এ টাকা দেয়া লাগে। স্থানভেদে কম-বেশি হয়ে থাকে। আপনি পরিমাণ মতো টাকা দিলে অন্যের জমি অথবা রাজউকের নিজের জমির মালিক হওয়ার সুযোগ আপনাকে করে দিতে তৈরি আছেন ওনারা।

স্বাস্থ্যসেবায় ঘুষ

সখিনা বেগমের বাড়ি কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বয়স ৫১ বছর। জীবনে কোনো দিন মোটরগাড়ি চোখে দেখেননি। জ্বর-সর্দি-কাশির জন্য গ্রাম্য হাটের কবিরাজের দাওয়াই খেয়েই বেশ চলেছে এতো দিন। হঠাৎ স্বামী অসুস্থ হলেন। বেশ ভালোই অসুখ। তিনি

তাকে নিয়ে এলেন শহরের হাসপাতালে।

এর পরের কাহিনী কতোটা করুণ তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সরকারি হাসপাতালের কথাই ধরা যাক। একেবারে বাইরের যে সদর-ফটক সেখান থেকে শুরু। দালাল বাহিনী কীভাবে, কী প্রকারে কী প্রলোভন দেখিয়ে তারা বেশির ভাগ রোগীকে তথাকথিত ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এই বেড়াজাল ডিঙিয়ে কেউ যদি টিকেট কাউন্টারে পৌঁছাতে পারে তো ভাবতে হবে সাপ-লুডু খেলা শুরু হলো মাত্র। কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন, লোকজন একে-ওকে ঠেলে যারপরনাই এগুতে চায়, আর কাউন্টারের ওপারে ভ্রূক্ষেপহীন নার্স অথবা কাউন্টারম্যান অপরিচ্ছন্ন ও ধোঁয়াটে হাতের লেখায় কলম পিষছে। তবে 'ব্ল্যাক' তথা দালালের হাতে ১০ টাকা দিলে ৬ টাকার টিকেট ঠিকই দ্রুত পেয়ে যাবেন। অসুস্থ রোগীর সুস্থ আত্মীয় বা সঙ্গে আসা গাইড অর্ধেক অসুস্থ হয়ে রোগীকে নিয়ে টিকিটের গায়ে লেখা রুমের সামনে হাজির। সেখানেও মোটামুটি এক জটলা। ডাক্তার নেই, জরুরি কাজে (!) ব্যস্ত, ওটিতে আছেন ইত্যাদি নানা অজুহাতে ২-৩ ঘণ্টা পার। এরপর অবশ্য ২-৩ মিনিটেই আপনি 'নক আউট' অর্থাৎ টিকিটের গায়ে বিচিত্র কিছু আঁকিবুঁকি নিয়ে সে রুম থেকে বের হয়ে এসেছেন। যদিও ডাক্তারের সহকারী পিয়নটিকে ২০, ৩০ বা ৫০ টাকা দিয়ে আগে 'সিরিয়াল' দিয়েছেন, লাভ হলো না কিছুই। অবশ্য এই মূল্য (মাত্র ২০ টাকা হারে) সরাসরি গ্রহণ করেন আমাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তাররা। আর বাইরের বেলায় এই উপঢৌকন একটু ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। সরাসরি কিছু 'দেয়ার' বদলে আপনি হাতে করে নিয়ে এসেছেন ডাক্তার সাহেবের পছন্দের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে করাতে হবে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফর্দ।

এরপর হাসপাতালে ভর্তি। অপরিচ্ছন্ন নোংরা কম্বলে মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা চলছে। ওয়ার্ডবয়, আয়া, দারোয়ান এমনকি ওয়ার্ড মাস্টার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঘুষ ঢালার পর একটি বিছানা। অসুস্থ হয়ে যে থুথু, কফ, রক্ত, পুঁজ ঝরছে সেই ময়লা পরিষ্কারের জন্য সুইপারকে দিতে হবে নিয়মিত মাসোহারা। বাথরুম ব্যবহারের জন্য ইনচার্জকে 'চার্জ' দিয়ে চাবি নিতে হবে। কোনো কোনো হাসপাতালের বারান্দায় রোগীদের রান্না করার জন্য চুলা ব্যবহার করা যায় সামান্য কিছু চার্জের বিনিময়ে। সরকারি হাসপাতালে নন-পেয়িং বেডের বেশির ভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফ্রি হলেও পরীক্ষার রিপোর্ট সরবরাহকারীকে দিতে হবে নগদ বকশিশ! আর পেয়িং হলে তো কথাই নেই। 'পেয়িং বিছানায় ঘুমান আর কিছু ঢালবেন না এইডা কেমুন কতা'! অপারেশনের পর অজ্ঞান রোগীকে যে ট্রলি বয় ঠেলে ঠেলে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসে তার আয় জানলে মনে হবে এই চাকরিটা কেন আমার হলো না!

আর যদি মা হওয়ার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তাহলে টাকা না দেয়ায় সদ্যোজাত শিশু নিয়ে টানা-হেঁচড়া এমনকি আটকে রাখার ঘটনার পুনরাবৃত্তি অবধারিত। পৃথিবীর আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুষ দেয়ার হাতেখড়ি হয়ে যায় শিশুদের।

হাসপাতালে রাখা ওষুধ ও জিনিসপত্র যেকোনো সময় হারিয়ে যেতে পারে। বিচিত্র কথা হচ্ছে, তা আবার উদ্ধারও করা যায়, তবে সামান্য (!) কিছুর বিনিময়ে।

হাসপাতালে ঘুষের চিত্র

বিষয়	পরিমাণ (টাকা)
১. ডাক্তার দেখানো (থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে)	২০ টাকা
২. সিরিয়াল দেয়া	১০ থেকে ৫০ টাকা
৩. ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেকোনো পরীক্ষার শতকরা ৩০% পান ডাক্তার	পরীক্ষা অনুযায়ী
৪. হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা	
রক্ত	১০-১৫%
মূত্র-	১০-১৫%
আল্ট্রাসনোগ্রাম	২০-৩০%
অন্যান্য (এক্স-রে)	১০-২০%
প্যাকেজ (সব একসঙ্গে)	৫০%
৫. সুইপার (দৈনিক)	২-৫ টাকা
৬. ট্রলি বয়	৩০-৪০ টাকা
৭. আয়া (ডেলিভারি/ বাচ্চা জীবিত)	২০০-৫০০ টাকা
৮. বাথরুম চার্জ/ রান্নাবান্না	২-৫ টাকা
৯. দালালচক্র (প্রতি রোগীর জন্য)	১০০ টাকা
১০. যেকোনো অপারেশন	৪০০-৫০০ টাকা

(সব ওষুধপত্র তো ব্যবহৃত হয় না, বরং কিছু বিক্রি হয় যেগুলো বিক্রয়ে/ প্রতি অপারেশন)

বিআরটিএ'তে বিভিন্ন কাজে ঘুষের রেট

১. ড্রাইভিং লাইসেন্স (৫টি পরীক্ষায় ৫০০ টাকা করে ২৫০০ টাকা)সহ	- ৫০০০ থেকে ৬০০০
২. ফিটনেস	- ১০০-১০০০
৩. রেজিস্ট্রেশন	- ২৫০০-৪৫০০
৪. রুট পারমিট	- ৮০০-২০০০
৫. মালিকানা পরিবর্তন	- ১০০০-১৫০০

পাসপোর্ট : বৈধ কিংবা অবৈধ

তিনভাবে পাসপোর্ট করা যায়: (ক) সাধারণ; (খ) জরুরি; এবং (গ) অতি জরুরি। এজন্য নির্ধারিত সরকারি ফি রয়েছে। সাধারণ পাসপোর্টে ২ হাজার টাকা, জরুরি ৩ হাজার এবং অতি জরুরি ৫ হাজার টাকা।

কোনো প্রকারের দালালের সহযোগিতা ছাড়া ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে রসিদসহ পাসপোর্ট অফিসে আবেদনপত্র দাখিল করার পর আরম্ভ হয় ঘুষের খেলা। অবশ্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়ার হাঙ্গামা এড়াতে হলে দালালকে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা দিতে হবে। পুলিশ অনুসন্ধানের জন্য এসবি অফিসারকে ৩০০ টাকা এবং থানার অনুসন্ধানী অফিসার যে বাসায় যাবে তাকে দিতে হবে ২০০ টাকা। জরুরি পাসপোর্টের জন্য ডিএসবি অফিসের কর্মকর্তাকে ৪০০ টাকা এবং পুলিশকে ৩০০ টাকা আর অতি জরুরি পাসপোর্টে ডিএসবি অফিসে ৫০০ টাকা এবং পুলিশকে ৪০০ টাকা দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীকেও ঘুষ দিতে হয়, যার পরিমাণ ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা হতে পারে। পাসপোর্ট নবায়ন করার ক্ষেত্রে ফি ৫০০ টাকা হলেও ব্যাংকে অতিরিক্ত ২০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। পাসপোর্ট সারেন্ডার করতেও ঘুষ দিতে হয়। যেকোনো এক জায়গায় ঘুষের টাকা না দিলে পাসপোর্ট আলোর মুখ দেখবে না। ২১ দিনে পাওয়ার কথা থাকলে ৬ মাসেও তা মিলবে না।

বেআইনি পাসপোর্ট মানে একই ব্যক্তি একাধিক কিংবা ভিন্ন পরিচয়ে পাসপোর্ট করতে চাইলে দালালদের শরণাপন্ন হতে হবে। পাসপোর্ট অফিসের কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই জাতীয় কাজ করে না। এতে খরচ পড়বে ১২-১৫ হাজার টাকা।

বিআরটিএ : সবই হবে প্রকাশ্যে

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) প্রধান কার্যালয় তেজগাঁওয়ের এলেনবাড়ি এলাকায়। এছাড়াও বিআরটিএ (উত্তর) অফিস মিরপুর ১৩ নম্বর সেকশনে। আর কেরানীগঞ্জের ইকুরিয়ায় অবস্থিত বিআরটিএ (দক্ষিণ) কার্যালয়। এ দু'টি অফিস থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ফিটনেস, রুট পারমিট, মালিকানা পরিবর্তন

এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। বিআরটিএ এলাকায় ঢুকলেই ঘিরে ধরবে দালালরা, 'ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির ফিটনেস, রুট পারমিট বা রেজিস্ট্রেশন কোনডা লাইগবো ? আসল না নকল কোনডা লাইগবো? আসল চাইলে রেট বেশি নকলে চললে অনেক কম।'

যে কাজেই হোক না কেন, সরকার নির্ধারিত ফি-র চেয়েও দ্বিগুণ-তিনগুণ টাকা গুনতে হবে। নইলে হয়রানি চরমে উঠবে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের সরকারি জমা ৬৫০ টাকা। কিন্তু এ জন্য খরচ করতে হয় ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। অন্যথায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পরিণত হয় সোনার হরিণে। আবার ফিটনেসের সময় গাড়ির গ্লাস ভাঙা থাকলে বা হেড লাইট না জ্বললেও কাউকে সমস্যায় পড়তে হয় না। স্রেফ ১০০ থেকে ২০০ টাকা ধরিয়ে দিলেই হলো। গাড়ি না এনেই গড়ির ফিটনেস করিয়ে নেওয়ার সুযোগও আছে, তবে এজন্য ৫০০ টাকার দুটি নোট গুঁজে দিতে হয় সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে।

কাস্টমস : আইসিডি (ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো)

আইসিডিতে ঘুষের খেলা চলে দিন-রাত। আমদানিকৃত পণ্য কাস্টম থেকে বের করার জন্য প্রথমে কম্পিউটার এন্ট্রি বাবদ ৭০০ টাকা, এপিএস বাবদ ২০০ টাকা, প্রিভেনটিভ ২০০ টাকা, সুপার ১ হাজার টাকা, ইন্সপেক্টর ২ হাজার টাকা, পোর্ট ৫০০ টাকা, বন্দর শ্রমিক বকশিশ ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা এবং কাস্টম অফিসারকে ২ হাজার টাকা দিতে হয়। অ্যাসেসমেন্ট পর্যায়ে সুপার ২ হাজার টাকা, ইন্সপেক্টর ৩ হাজার টাকা, সহকারী কমিশনারের সিপাই ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা, জয়েন্ট কমিশনারের সিপাই ৪০০ টাকা এবং পিয়নের জন্য ২০০ টাকা হার ধার্য করা আছে বলে আমদানিকারকরা জানালেন।

নরমাল পেপারের ক্ষেত্রে গ্রুপ-১ সহকারী কমিশনার ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা, গ্রুপ-২ সহকারী কমিশনারকে ৩ হাজার টাকা দিতে হয়। মালামাল খালাসের ক্ষেত্রে বন্দরের স্টাফ খরচ ১১টি টেবিল বাবদ ৫০০০ টাকা দিতে হয়।

নিরাপত্তা বিভাগের গেট এসআই ৮০০ টাকা, গেট সার্জেন্ট ৪০০ টাকা, শুল্ক গোয়েন্দা ৩ হাজার টাকা, প্রিভেনটিভ বাবদ ৩ হাজার টাকা, শ্রমিক বকশিশ মালামাল ডেলিভারি বাবদ ১ হাজার টাকা দিতে হয়। আইসিডিতে পণ্য আমদানি করার জন্য সবাইকে এই ফর্মুলা মেনে চলতে হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইসিডির একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আমদানিকারকরা তাদের পণ্য ছাড় করাতে বাড়তি কিছু টাকা ব্যয় করে কাজটা একটু দ্রুত করানোর জন্য। তবে আপনারা যেভাবে বলছেন, সেরকম কোনো ঘুষের রেট এখানে নেই।'

পণ্য রপ্তানি করতে হলে পেপার অ্যাসেসমেন্ট ৮-৯ শত টাকা, পরীক্ষা বাবদ ৬০০ টাকা, বন্দর কর্তৃপক্ষ ৭০০ টাকা, শ্রমিক বকশিশ ১৫০ টাকা, ইএক্সপি ছাড়করণ ৪০০ টাকা দিতে হয়।

বিমানবন্দর

বিমানবন্দরে সাধারণ আধা কেজি পণ্য রপ্তানি করতে ৫০০ টাকা, ১০-১৫ কেজি হলে ১৫ হাজার টাকা, বাণিজ্যিক হলে ৩৫-৪০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে কোনো প্রকল্পের জন্য ঋণ নিতে হলে ঋণের পরিমাণের ওপর ৫% পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। তবে ঋণের পরিমাণ খুব অল্প হলে ২ থেকে ৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

আয়কর বিভাগ

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে আয়কর ফাইল খুলতে হলে করপরিদর্শককে ১ হাজার টাকা, সহকারী কর কমিশনার ২-৩ হাজার টাকা ও পিয়নকে ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আয়কর উকিল ফাইল তৈরি করে দেয়। তারও একটা ফি আছে। সব মিলিয়ে পড়ে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা।

হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন

হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে ঘুষের ব্যাপারটা চলে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে এবং ঋণ নেয়ার পর কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে। এখান থেকে ঋণ নিতে হলে প্যাকেজ প্রোগ্রামে যেতে হয়।

কাজ শুরুর আগে অগ্রিম হিসেবে ৪০ হাজার টাকা দিতে হয়। ঋণ পাওয়ার পর আরো ৬০ হাজার টাকা দিতে হয়। ঋণের পরিমাণ বেশি হলে টাকাও বেড়ে যায়। সাধারণত ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া প্রযোজ্য। ১০ থেকে ৫০ লাখ টাকা হলে ঘুষের পরিমাণ ৩ থেকে ৫ লাখ টাকায় দাঁড়ায়।

'বিভিন্ন সেক্টরে ঘুষের লেনদেন হয় বিষয়টি সত্য'

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া, কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশে অলিখিতভাবে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুষের লেনদেন হয়, এ বিষয়ে কী কমিশন অবহিত আছে?

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া : দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে ঘুষের ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন সময় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তা দেখেছি। বিভিন্ন সেক্টরে ঘুষের লেনদেন হয় বিষয়টি সত্য।

২০০০ : ঘুষের লেনদেন বা দুর্নীতি নিরসন করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কী?

মনিরুজ্জামান মিয়া : দুর্নীতি দমন কমিশনের দীর্ঘ নয় মাস চলে গেছে। এখানে জনবল কাঠামো তৈরি করা হয়নি। দুর্নীতি দমন ব্যুরো লুপ্ত হওয়ার পর একই জনবল নিয়ে আমি কাজ করতে চাইনি। এখন লোকজন যাচাই-বাছাই করে নতুনভাবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এরপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটছে তা মামলা করে শেষ করা যাবে না। আমাদের আইনি প্রক্রিয়া দীর্ঘ। ফল ইতিবাচক হয় না। দুর্নীতি ঘটার কারণ হচ্ছে আইনের জটিলতা। আমাদের আইনগুলো সরল নয়। তাই আমাদের উচিত হবে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। আমরা সেই লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা করেছি। আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, আইজিপির সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে কথা বলবো। তারা সে লক্ষ্যে কাজ করছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।

২০০০ : আপনার দৃষ্টিতে কোন খাত সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ বলে মনে হয়।

মনিরুজ্জামান মিয়া : ঘুষ বা দুর্নীতি পরিমাপের বিষয় নয়। এটা কীভাবে পরিমাপ করা হবে? কাজেই আমি কাউকে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্নভাবে চিহ্নিত করতে চাই না।

২০০০ : দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে বর্তমান সরকারের কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন কী?

মনিরুজ্জামান মিয়া : দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতি দমনের জন্য আমাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমরা অচিরেই জাতিকে একটি ভালো ফল উপহার দিতে পারবো।

বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘুষ বাণিজ্য

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৫০ হাজার থেকে দুই লাখ টাকায় ভর্তি হওয়া যায়। অবিশ্বাস্য এবং চমকে দেয়ার মতো খবর। কলা অনুষদে ভর্তির জন্য প্রয়োজন ৫০ থেকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির জন্য এক থেকে দুই লাখ টাকা। তবে টাকা দিয়ে ভর্তির সুযোগ খুব সীমিত এবং তা গুটিকয়েক বিভাগে প্রযোজ্য। বছরে প্রায় ১০০ জন এভাবে ভর্তি হয়। এখানে ঘুষের চেয়েও বেশি প্রয়োজন লবিং। সাধারণত ছাত্রনেতারা এর পেছনে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, কলা অনুষদের বাংলা, লোক প্রশাসন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সমাজকল্যাণে ভর্তির জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে এক লাখ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান অনুষদের কিছু বিভাগে ভর্তির জন্য নেয়া হয় দেড় লাখ টাকা। কলা অনুষদে ভর্তির জন্য যে টাকা নেয়া হয় তার ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা দিতে হয় রেজিস্ট্রার ভবনে বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে। বাকি টাকা দালালরা পায়। বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির জন্য দিতে হয় এক লাখ ২০ হাজার টাকা। রেজিস্ট্রার ভবনের ভর্তি বিভাগের সঙ্গে যারা জড়িত তারাই এই টাকার বেশির ভাগ অংশ পেয়ে থাকেন। এদের মাধ্যমে ডিন অফিসেও ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা যায়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে এসব অবৈধ ভর্তি করা হয়। কোনো ছাত্র যদি ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিট (কলা অনুষদ) এবং 'ঘ' ইউনিট দুটোতেই সুযোগ পায়, তাহলে সে যে ইউনিটে ভর্তি হয় না, সেই ইউনিটের মেধা তালিকায় তার নামের জায়গায় আরেকজনের নাম বসিয়ে দেয়া হয়।

আবার কোনো বিভাগে ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মাইগ্রেশনের মাধ্যমে এক বা একাধিক ছাত্র অন্য বিভাগে চলে গেলে সিট ফাঁকা হয়। তখন ঐ জায়গায় অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ঝুঁকি একটু বেশি থাকে মানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ফলে টাকাও কম লাগে। দালালদের ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা দিলেই হয়। এ পদ্ধতিতে বিভাগ থেকে শুরু করে হল অফিসে টাকা দিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক জায়গায় নিবন্ধন খাতায় নতুন করে নাম তুলতে হয়। এমনকি ঐ বিভাগের টিউটরিয়াল অথবা ইনকোর্স খাতায় আলাদাভাবে নাম তোলা হয়।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোটা রয়েছে। যেমন মুক্তিযোদ্ধা-পোষ্য কোটা, শিক্ষক-পোষ্য কোটা। উপাচার্যের বিশেষ সুপারিশেও এক-দু'জন ভর্তি হয়ে থাকে। মূলত এসব সিটে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে।

স্কুল ভর্তির ডোনেশন

স্কুলে ভর্তির ডোনেশন প্রথা প্রথমে চালু করেছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো। এখন বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো তাদের ছাড়িয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে এই টাকার বেশির ভাগই চলে যায় দালালদের পকেটে যারা খোদ স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য। সেজন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন যেন ছোটখাটো জাতীয় নির্বাচনে রূপ নেয়। ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হতে পারলেই ২০/৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করানোর অলিখিত লাইসেন্স মিলে যায়। কোন কোন স্কুলের সদস্যগণ নাকি বছরে ২০ থেকে ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থ আয় করে থাকেন ছাত্র ভতি থেকে। এ ক্ষেত্রে ৫০ হাজার থেকে নাকি ৫ লাখ টাকায় ভর্তি করার নজিরও আছে। ঘুষের এক মার্জিত রূপ এই ডোনেশন।

জমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি ও পর্চা

সরকারি অফিসে বিকেল ৪টার পর কাকপক্ষীও থাকে না এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় দেশের জমি রেজিস্ট্রি অফিসগুলোয়। জমি কেনাবেচা যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হয় রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে। দেশে ৪৭৫টি রেজিস্ট্রি অফিস আছে। থানা রেজিস্ট্রি অফিসের ওপর জেলা রেজিস্ট্রি অফিস। জেলা পর্যায়ে জেলা রেজিস্ট্রার এবং তারপর আইজিআর। এরপর আইনমন্ত্রী।

কোনো জমি কিনতে দলিলমূল্যের প্রতি লাখ টাকায় ১২ হাজার টাকা অফিসে ঘুষ হিসেবে যাবে। আর ২ হাজারের মতো পাবে সরকার। ঘুষের অর্থ ৯ ভাগ হয়ে জেলা রেজিস্ট্রার, হেডক্লার্ক, আইজিআর এবং মন্ত্রণালয় পর্যন্ত যায়।

ঘুষের শুরু এক্সট্রা মোহরারদের থেকে। এক লাখ টাকার ক্রয়-বিক্রয়ে এক্সটা মোহরাররা পায় মাত্র ২৫ টাকা। তবে একটা জমির বেচাকেনার সঙ্গে ৩ থেকে ৭ জন এক্সট্রা মোহরার জড়িত থাকে। এক্সট্রা মোহরারের থেকে সরকারি মোহরার। তেজগাঁও রেজিস্ট্রার কমপ্লেক্সের এক্সট্রা মোহরার মাসুক জানালো, তার কাছে কেউ এলে সে নিয়ে যায় সরকারি মোহরার আব্দুল হাকিমের কাছে। সেখান থেকে কেরানির কাছে। একটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে একজন মাত্র কেরানি থাকে। কেরানি লাখে ১ থেকে ২ হাজার টাকা নিলেও মোহরারদের দেয় ৫০০ টাকা। একটি জমি বেচাকেনায় ৩ থেকে ৪ জন মোহরার যুক্ত থাকে। সংখ্যা যাই হোক, কেরানি মোহরারদের ৫০০ টাকা করেই দিয়ে থাকে। কেরানির সঙ্গে অবশ্য পিয়নও যুক্ত থাকে। দিন শেষে পিয়নকে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা ধরিয়ে দেয় কেরানি। কেরানি পিয়নকে ধরাবাঁধা কোনো টাকা দেয় না। তবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সবচেয়ে বড় অংশ পান রেজিস্ট্রার সাহেব। এক লাখে ২ থেকে ৫ হাজার পর্যন্ত তার বরাদ্দ।

সাধারণত জমি যারা কেনেন তারা দলিলে প্রকৃত মূল্য লিখতে চান না মূলত কর ফাঁকি দেয়ার জন্য। ১০ লাখ টাকার জমির দলিল হয় তাই ৪ লাখ টাকায়। সে কারণেই দলিল মূল্যে লাখে ১২ হাজারের বাইরেও অর্থ ব্যয় করতে হয় ক্রেতাকে। ক্ষেত্র বিশেষে তা লাখে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। সাফ কবলায় এভাবে বড় অঙ্কের টাকা ঘুষ দিতে হলেও হেবা দলিলে সর্ব-সাকুল্যে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়।

জমিজমা সংক্রান্ত আর একটা অফিসে যেতে হয়। তা হলো সেটেলমেন্ট অফিস। জমির ভৌগোলিক পরিমাপ জানতে হলে এ অফিসে যেতে হয়। ভৌগোলিক এ পরিমাপকে বলে পর্চা। পর্চা তুলতে আপনার বৈধভাবে খরচ স্ট্যাম্প ফি ৫ টাকা আর একটি ফরম কিনতে হবে যার দাম আড়াই টাকা। সরকারি কোষাগারে এই সাড়ে সাত টাকা জমা পড়ে। কিন্তু আপনার খরচ হবে কমপক্ষে ৩০০ টাকা। দ্রুত তুলতে হলে ৭০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়।

জমির দলিল লেখায়ও খরচ গুনতে হয়। মিরপুরের জুবায়ের সাহেব ১২ লাখ টাকায় জমি কিনেছেন সব মিলিয়ে খরচ পড়েছে এক লাখ ৯২ হাজার। এর মধ্যে দলিল লিখতে

অবিশ্বাস্য এবং চমকে দেয়ার মতো খবর। কলা অনুষদে ভর্তির জন্য প্রয়োজন ৫০ থেকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির জন্য এক থেকে দুই লাখ টাকা। তবে টাকা দিয়ে ভর্তির সুযোগ খুব সীমিত এবং তা গুটিকয়েক বিভাগে প্রযোজ্য। বছরে প্রায় ১০০ জন এভাবে ভর্তি হয়। এখানে ঘুষের চেয়েও বেশি প্রয়োজন লবিং। সাধারণত ছাত্রনেতারা এর পেছনে থাকে

খরচ হয়েছে ২০ হাজার টাকা। বায়া দলিল লিখতে মূল খরচ ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বলা হলেও প্রকৃতভাবে খরচ ২ হাজার টাকা। নাম জারি করাতে নির্ধারিত ফি যাই হোক তহশিলদারদের মর্জিমাফিক ২ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ গুনতে হয়। দলিলের নকল কপি তুলতে অফিস খরচ ৮ টাকা হলেও প্রকৃত খরচ হবে এক থেকে দেড় হাজার টাকা। অবশ্য নকল দলিলের খরচ ভিন্ন রকমও হতে পারে। আপনার দলিল যদি ৫ পাতার হয় তবে তল্লাশি করাতে পাতা হিসাবে ১০ টাকা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আপনার দলিল ৫ পাতা ১০ লাইন হয়েছে। তল্লাশিকারককে লাইনপ্রতি ১০ টাকা দিতে হবে। তবে এতে সরকারি ফি'র কোনো হেরফের হয় না।

রেজিস্ট্রি অফিসে যারা স্ট্যাম্প বিক্রি করে তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত। এই লাইসেন্স পেতেও ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। অপরদিকে দলিল লেখকদেরও লাইসেন্স আছে। দলিল লেখকদের লাইসেন্স পেতে হলে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় জেলা রেজিস্ট্রারদের।

শিক্ষা ভবন না উৎকোচ ভবন

ঘুষের টাকা সঙ্গে না নিয়ে শিক্ষা ভবনে যাওয়ার কথা চিন্তাও করবেন না। এমনকি সঠিক ব্যক্তি ছাড়া ঘুষ দেয়ার চিন্তাও করবেন না, তাতে আপনার কাজও হবে না, টাকাও আর ফেরত পাবেন না। এখানে ঘুষ দেয়ার সঠিক লোককে চিনে ঘুষ দিতে হয়। পিয়নের হাতে কিছু ধরিয়ে না দিলে সে আপনাকে জানাবে না আপনার সমস্যা সমাধানে কার কাছে যেতে হবে। সে ঘুষের পরিমাণ ২০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের জন্যে আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে। ঘুষের লেনদেন সাধারণত কর্মকর্তারা করেন না। তাদের কাছে ঘুষ দিতে গেলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘুষের লেনদেন করে কেরানি বা কর্মকর্তাদের পিএ/পিএসগণ।

এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ৩০ থেকে ৬০ হাজার টাকা দিতে হয়। এটার পরিমাণ নির্ভর করে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবস্থার ওপর। প্রতিষ্ঠানের অবস্থা যত খারাপ, ঘুষ তত বেশি। অনেক সময় এলাকাভিত্তিক সম্পর্কের কারণে কমও লাগে। একইভাবে শিক্ষকদের গ্রেড পরিবর্তনে ২০০-৩০০ টাকা, শিক্ষকদের বেতন মঞ্জুরকরণে ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। বদলি করা কিংবা ঠেকাতে ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা লাগে। এখানে সরকারপন্থি শিক্ষকদের কিছুটা কম লাগে এবং নেতা গোছের কেউ হলে অনেক সময় লাগে না। এছাড়া কোনো কারণে প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অনুদান বা বেতন বন্ধ হয়ে গেলে তা পুনরায় চালু করতে যথাক্রমে ২৫-৩০ হাজার টাকা এবং ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।

পেনশনের কাগজপত্র প্রসেসিংয়ে ঘুষ দিতে হয়। তার পরিমাণ ১০-১২ হাজার টাকা বলে একজন ভুক্তভোগী জানান।

প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পূর্বে পরিদর্শককে ঘুষ দিতে হয়। যাতে রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ঐ প্রতিষ্ঠান ভালো। এই ঘুষের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা।

রাজধানীসহ বড় শহরগুলোর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কিংবা কিন্ডারগার্টেনের অনুমতি নিতে বিশাল অঙ্কের ঘুষ দিতে হয়। একই অবস্থা হাইস্কুল এবং কলেজের ক্ষেত্রেও। এই ঘুষের পরিমাণ কমপক্ষে ১ লাখ টাকা। এই জাতীয় বড় লেনদেন বড় কর্মকর্তারা করে থাকেন বলে সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাথমিক বিদ্যালয় শাখার একজন কম্পিউটার অপারেটর। মাদ্রাসা বিভাগে ঘুষ এবং দুর্নীতিও একই তালে চলছে। এখানে যার কাছ থেকে যা নিয়ে পারে।

পানি-বিদ্যুৎ-টেলিফোন

ডেসা ও পিডিবি'র মিটার রিডারদের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে পারলে আপনি অনেক কম বিদ্যুৎ বিল দিয়ে পারবেন। কলকারখানার মালিকরা এভাবেই ওদের সঙ্গে চুক্তিতে এসে কোটি কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল কম দেন। একই পদ্ধতিতে গ্যাস কোম্পনিগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেন শিল্প মালিক পক্ষ। টিএন্ডটি ফোন পাওয়া এবং তা সচল রাখাতে গ্রাহকদের নিয়মিত অর্থ খরচ করতে হয়। সরকার নির্ধারিত ১০ হাজার টাকা ফি'র অতিরিক্ত আরো ৫ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচসাপেক্ষে ৭ থেকে ১৫ দিনে দিনেই সংযোগ পেতে পারেন। টাকা খরচ না করলে ৭ বছরে নাও পেতে পারেন।

শেষ কথা

'হবু রাজা গবু মন্ত্রী' গল্পের কথা মনে আছে? হবু রাজা কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না যে ঘুষ নামক কোনো খাদ্য-বস্তু তিনি কখনো খেয়েছেন। তাকে যখন বলা হলো, তার আশপাশের সবাই ঘুষ খায়, তিনি তাও বিশ্বাস করেননি। বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনের উচ্চপদে যারা আছেন, তারাও বোধ হয় এরকমই মনে করেন। সে কারণেই বাংলাদেশের দুর্নীতির প্রধান উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঘুষ। গড়ে উঠেছে ঘুষের বাজার। চাহিদা-যোগানের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় বাড়ছে ঘুষের দর। অথচ এই ঘুষ প্রকারান্তরে জনগণের ওপর অনানুষ্ঠানিক কর। এই করের বোঝা যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রকৃত কর থেকে জনসাধারণ আরো বেশি মুখ ফিরিয়ে নেবে।

শিক্ষাভবনে ঘুষের হার

প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের গ্রেড পরিবর্তনে	- ২০০ থেকে ৩০০ টাকা
Cined অন্তর্ভুক্তকরণে	- ৩০০ টাকা (প্রতি শিক্ষক)
এমপিওভুক্তকরণে	- ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা
শিক্ষকদের বেতন মঞ্জুরকরণে	- ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা (প্রতি শিক্ষক)
বদলি করা কিংবা ঠেকাতে	- ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা
পেনশনের কাগজপত্র প্রসেসিং করাতে	- ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা

এমপিওভুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে পরিদর্শনে গেলে পরিদর্শককে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়

বিএড অন্তর্ভুক্তকরণে	- ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা
এমপিওভুক্তকরণে	- ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা
শিক্ষকদের বেতন মঞ্জুরকরণে	- ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা (প্রতি শিক্ষক)
সরকারি স্কুলে বদলি সংক্রান্ত	- ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা
পেনশন সংক্রান্ত কাজে	- ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা
পরিদর্শক কিংবা তার রিপোর্ট পরিবর্তনে	- ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।

কলেজ

এমপিওভুক্তকরণে	- ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা
শিক্ষক বেতন পাস করতে	- ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা
পরিদর্শক	- ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।